



## বিদ্যাসুন্দর যাত্রার উদ্ভব, গোপাল উড়ে ও রাম বসুর কৃতিত্ব : একটি সমীক্ষা

Minati Sau Bhaumik<sup>1</sup> & Dr. Sanchita Banerjee Roy<sup>2</sup>

1. Research Scholar, Dept. of Bengali, YBN University, Ranchi, Email: [saubhaumikminati@gmail.com](mailto:saubhaumikminati@gmail.com)
2. Asst. Professor, Dept. of Bengali, YBN University, Ranchi, Email: [banerjeesanchita28@gmail.com](mailto:banerjeesanchita28@gmail.com)

**Abstract:** অষ্টাদশ শতকের ভারতচন্দ্রের ‘বিদ্যাসুন্দর’ কাব্য যাত্রাপালা হিসেবে ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলায়, বিশেষত কলকাতায় নতুন রূপ লাভ করেছিল। ‘অন্নদামঙ্গল’ কাব্যের দ্বিতীয় খণ্ড হিসেবে ‘বিদ্যাসুন্দর’ কাব্যের ব্যাপক জনপ্রিয়তার কারণে ভারতচন্দ্রও বিদ্যাসুন্দরের কবিরূপে পরিচিত হন। এই যাত্রার মূল আখ্যান ছিল বর্ধমানের রাজকন্যা বিদ্যা এবং কাঞ্চীর রাজকুমার সুন্দরের গোপন মিলনকে কেন্দ্র করে। কবিওয়ালাদের যুগে এই যাত্রায় নৃত্য ও গীতের আধিক্য ছিল, যা কবি-সঙ্গীতের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। কলকাতায় মহারাজীয় বাইজীদের আগমনের পর যাত্রা-সঙ্গীতে তবলা ও ঘুড়ুর ব্যবহার শুরু হয় এবং টপ্পা গান জনপ্রিয়তা লাভ করে। এই পটভূমিতেই গোপাল উড়িয়ার হাতে বিদ্যাসুন্দর যাত্রার পথচলা। গোপাল প্রবর্তিত নৃত্যের নতুন রীতি সম্ভবত উড়িয়া সংস্কৃতির বঙ্গীয়করণ ছিল। তিনি যাত্রা থেকে পয়ার সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে গান ও নাচকে একত্রিত করে একটি পুরো ‘Ballet’ তৈরি করেন। গোপাল উড়িয়ার যাত্রা ছিল আদিরস-ভিত্তিক ও আধ্যাত্মিকতা-বর্জিত, যা ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের বাঙালির বিকৃত রস-পিপাসার চরম দলিল হয়ে ওঠে। গোপালের পালায় ব্যবহৃত চলিত বাংলা ভাষায় রচিত অনেক গান রাম বসুর রচনা হতে পারে বলে অনুমান করা হয়, যা তৎকালীন মজলিশী সমাজের বে-আক্ৰ ভাষা ছিল।

**Keywords:** যাত্রা, ভারতচন্দ্র, বিদ্যাসুন্দর যাত্রা, গোপাল উড়িয়া, গোপাল উড়ে, টপ্পা গান, রাম বসু।

**Introduction:** ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল তিন খণ্ডে বিভক্ত- (ক) অন্নদামঙ্গল, (খ) বিদ্যাসুন্দর, (গ) অন্নপূর্ণামঙ্গল। ছাপাখানার কল্যাণে বহু দ্বিতীয় খণ্ড ‘বিদ্যাসুন্দর’ তৎকালীন জনমানসে ছাপা হয়ে প্রচারিত হয়। ভারতচন্দ্রও বিদ্যাসুন্দরের কবিরূপে খ্যাতি লাভ করেছেন। এর মূল কাহিনী হল-বর্ধমানরাজ বীরসিংহের পরম রূপসী ও বিদুষী কন্যা বিদ্যা ও কাঞ্চীরাজ গুণসিঙ্ঘের পুত্র সুন্দরের গোপন মিলনই এর প্রধান আখ্যান। নায়ক সুন্দর দেবী কালিকার কৃপায় সুড়ঙ্গ খনন করে সুগোপনে অনুচর রাজকন্যা নায়িকা বিদ্যার শয়নগৃহে উপস্থিত হয়। ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর-এর সুর মূলত গীতি-প্রধান। কথিত আছে, বিদ্যাসুন্দর কাব্য রচনা করে ভারতচন্দ্র তা কৃষ্ণচন্দ্রের কাছে উপস্থিত করেন। কৃষ্ণচন্দ্র তখন কাজে ব্যস্ত থাকায় বইটি পাশে রেখে দেন। তাই ভারতচন্দ্র কিছুক্ষণ পর মহারাজকে বললেন- “মহারাজ, পুঁথিখানি এইভাবে রাখিবেন না, ইহার রস গড়াইয়া পড়িবে।”, তা শুনে কৃষ্ণচন্দ্র পুঁথিটি খুলে দু’একটি পাতা পড়লেন ও পড়ে বললেন- “বাস্তবিকই যে রস তুমি সৃষ্টি করিয়াছ, তাহা গড়াইয়া পড়িবারই মত।” এই কাহিনী অবলম্বনে নির্মিত যাত্রাপালাই ‘বিদ্যাসুন্দর যাত্রা’ নাম পরিচিত। নতুন ধরনের যাত্রায় কবিওয়ালাদের যুগে যাত্রা-সঙ্গীতকে অচিরেই কবি-সঙ্গীত প্রায় গ্রাস করে ফেলেছিল, যার প্রমাণ এই বিদ্যাসুন্দর যাত্রা। কলকাতায় যাত্রায়নৃত্যগীতের ক্ষেত্রে, প্রমোদকলার ক্ষেত্রে রুচি পরিবর্তনের সামান্য ইতিহাস ‘বঙ্গদর্শনে’ বিবৃত হয়েছে।

**Discussion:** অষ্টাদশ শতকের শেষ দ্বাদশ থেকে কলকাতায় মহারাজীয় বাইজীদের আগমন ঘটতে থাকে। তাদের আগমনে খেলের পরিবর্তে তবলার প্রতিপত্তি হল, নূপুরের বদলে এল ঘুড়ুর। মনোহারশাহীকে বিদায় দিয়ে টপ্পার ভজনা শুরু হল। এই

পটভূমিকায় বিদ্যাসুন্দর যাত্রা তার যোগ্যতা প্রমাণ করল। নায়ক নায়িকার প্রেমালাপ, বিভেদ, মিলন ইত্যাদির অভিনয় করে শ্রোতার চিত্তরঞ্জন করা প্রায় সকল যাত্রার উদ্দেশ্য। কিন্তু বিদ্যাসুন্দর আরও একটু পৃথক-

“বিদ্যাসুন্দরের মিলন পর্যন্ত অভিনীত হইয়া থাকে। ...বিদ্যাসুন্দরের মধ্যে বিচ্ছেদ অত্যন্ত অল্প। সুন্দরের আসিতে যেটুকু বিলম্ব হয়, সেইটুকুই বিদ্যার বিচ্ছেদ যজ্ঞণা।”<sup>৩</sup>

-এই হল বিদ্যাসুন্দর পালার মুখ্য আবেদন। এই অভিনয়ের রীতি সম্পর্কে জানা যায়-

“বিদ্যা আরও ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নাচিতে থাকে। রসিক শ্রোতাদের আত্মাদের আর সীমা থাকে না। বিদ্যার কঙ্কাল কেমন দুলিতেছে, বেশ্যা স্বভাবানুকরণে সুপটু নট, কেমন নয়ন হৃদয়ে, ইত্যাদি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নাচাইতেছে, ইহা দেখিয়া দূর্ভাগা সুন্দরের বিপদ শ্রোতারা একেবারে ভুলিয়া যায়। এক্ষণকার রুচির এই এক পরিচয়। শোকাকুলা নাচিয়া হাসিয়া চোক ঠারিয়া শোক করিতেছে, আর আমাদিগের চিত্ত আর্দ্র হইতেছে। শ্রোতাদিগের অন্য কেহ কেহ বলিতেছে, বড় আশ্চর্য যাত্রা হইতেছে। এমন যাত্রা না শুনিয়া অরসিক বৃদ্ধেরা কৃষ্ণবিষয়কীর্তন শুনিতে ইচ্ছা করেন কেন? কেহ বলিতেছেন যে, তাঁহারা ধর্মার্থে কালিয়দমন যাত্রা শুনিয়া থাকেন, সুখার্থে নহে। এরূপ শ্রোতাদিগের বুঝাইতে চেষ্টা করা বৃথা।”<sup>৪</sup>

নগেন্দ্রনাথ বসু বিদ্যাসুন্দর যাত্রার এই নৃত্যের চরিত্র বিশ্লেষণ করে লিখেছেন-

“যখন সমগ্র বাঙ্গালায় বিদ্যাসুন্দরের প্রভাব বিস্তৃত হইয়া পড়ে, তখন হইতেই বঙ্গবাসী খেমটা নাচের পক্ষপাতী হইতে থাকে; সুতরাং সেই সময়ে এরূপ নৃত্যের উপযোগীসুরোদ্ভাবনও আবশ্যিক হইয়া পড়িয়াছিল। নৃত্যের ব্যাপারে যাত্রার সমস্ত শোভা নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। কি মেথর, কি ভিত্তি, কি মালিনী, কি বিদ্যা, সকলেই নৃত্য দ্বারা দর্শকমণ্ডলীর তৃপ্তি সাধন করিতে প্রয়াস পাইত। যাত্রায় কৃষ্ণের নৃত্য, রাধার নৃত্য, রাবণের নৃত্য, সীতার নৃত্য, কৈকেয়ীর নৃত্য প্রভৃতি অরুচিকর ও সাধারণ নিয়মের বহির্ভূত এবং অসম্ভাবজনক ব্যাপারের অবতারণা বড়ই ক্লেশকর।”<sup>৫</sup>

কৃষ্ণযাত্রার সঙ্গে বিদ্যাসুন্দরের ভাববৃত্তের তুলনা করলে বলা যায়, সুন্দরকে সত্য সত্যই বেঁধে আনা হলেও তাতে কিন্তু তখনও বিন্দুমাত্র করুণ রস নেই। অথচ কৃষ্ণকে বাঁধবার কথা উঠতেই রাধা কেঁদে আকুল। কৃষ্ণযাত্রা সম্বন্ধে বলা হয়েছে-

“উহার প্রণেতৃগণ ধর্মপ্রাণ ছিলেন এবং শ্রোতৃগণ অপেক্ষাকৃত রসজ্ঞ ছিলেন। ক্রমে উভয়েরই এক্ষণে অধপতন হইয়াছে। অধিক কি, পূর্বে যে যাত্রার যে স্থলে দেবতা এবং দেবতুল্য ঋষি সাজাইত, এক্ষণে সেই স্থলে মেতর মেতরানী সাজিয়া শ্রোতাদিগের মনোরঞ্জন করা হয়।”<sup>৬</sup>

‘কালিয়দমন যাত্রা’র নৃত্য আর ‘বিদ্যাসুন্দর যাত্রা’র নৃত্য এক নয়। রাধা দূতী খেমটা নাচেনি। শর্মিষ্ঠা সমালোচনা প্রসঙ্গে মনস্বী রাজেন্দ্রলাল মিত্র বলেছেন বিদ্যাসুন্দর যাত্রা সকলের প্রিয়। এখন কথা হচ্ছে এই বিদ্যাসুন্দর যাত্রার প্রবর্তক কে? এ বিষয়ে মোটামুটি স্বীকৃত তথ্য এই যে, বরাহনগরের রামজয় মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় প্রথম সখের বিদ্যাসুন্দর যাত্রা করেন, সে হল ১৮২২ সালের কথা। কিন্তু তখনও এ পালা তত জনপ্রিয় হয়নি; পরে হাওড়া জেলায় ঠাকুরদাস দত্ত বিদ্যাসুন্দরের দল করেন। এ দলও তত খ্যাতি লাভ করেনি। আরও কয়েকজন বিদ্যাসুন্দর পালা যাত্রায় রূপান্তরিত করেন; কারও পালা তেমন জনপ্রিয় হল না। বিদ্যাসুন্দর যাত্রার প্রকৃত রূপ ফুটে উঠলো গোপাল উড়িয়ার হাতে।

কলকাতার বহুবাজারের রাধামোহন সরকার নামক এক ভদ্রলোক ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে এক বিদ্যাসুন্দর যাত্রার দল খোলেন। এই দলে গোপাল যোগদান করেন, গোপাল ছিলেন জাতিতে করণ; বাড়ি যাজপুর, উড়িষ্যা। সামান্য ফেরিওয়ালা হিসাবে তিনি কলকাতায় আসেন ১৮-১৯ বৎসর বয়সে। কি ভাবে তিনি রাধামোহন সরকারের দলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, এ বিষয়ে দুর্গাদাস লাহিড়ী একটি কাহিনী বলেছেন-

“একদিন মধ্যাহ্নের বৈঠক চলিতেছে, এমন সময় একজন ফেরিওয়ালা “চাঁপা কলা” বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। চীৎকার বৈঠকখানার বাবুদের কর্ণে আসিল। বিশ্বনাথ মতিলাল তৎক্ষণাৎ ছুকুম দিলেন- ‘ওরে কে আছিস রে, ‘গান্ধার’ বলছে চাঁপা-কলাওয়ালাকে ধরে আন।’ লোকজন গিয়া চাঁপা কলাওয়ালাকে ধরিয়া আনিла। এই চাঁপা কলাওয়ালা গোপাল উড়ে।”<sup>৭</sup>

তিনি আরও বলেছেন, রাধামোহন সরকারের গৃহে গোপাল দশ টাকা মাহিনায় নিযুক্ত হলেন। বাড়ির ওস্তাদ হরি কিষণ মিশ্রের কাছে গোপাল গান শিখতে লাগলেন, এবং কিছু দিনের মধ্যেই ঠুংরি গানে দক্ষ হয়ে উঠলেন। গোপাল ছিলেন সুপুরুষ, তাঁর কণ্ঠস্বর মিষ্ট। তার ওপরে তিনি জানতেন নাচ।

ওড়িষ্যার আর একটি নর্তক দল কলকাতায় ‘রামলীলা’ যাত্রা অভিনয় করেছিল। ‘সমাচার দর্পণ’ পত্রিকায় ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে জানুয়ারি সংখ্যায় এদের অভিনয়প্রসঙ্গ উল্লিখিত হয়েছে। অভিনেতাদের ‘উড়িয়া নৃত্যকর’ বলা হয়েছে। উড়িষ্যার যাত্রা এক জাতীয় নৃত্য-ভিত্তিক অভিনয়-অনুষ্ঠান, এ-বিষয়ে সন্দেহ নেই। এর কাছাকাছি সময়ে গোপাল কলকাতায় আসেন এবং রাধামোহন সরকারের দলের সঙ্গে যুক্ত হন। গোপাল কি উড়িয়া যাত্রা-রীতির সঙ্গে পরিচিত ছিলেন না? তাঁর জীবনীকার এ-বিষয়ে নির্বাক। কিন্তু এ-বিষয়ে সবাই অবহিত যে, গোপাল-প্রবর্তিত নৃত্য এক নতুন রীতির নৃত্য। রাধামোহনের মৃত্যু হলে গোপাল নিজেই দল গঠন করেন। ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে গোপালের মৃত্যু হয়। গোপালের দলের তিন জন অভিনেতার নাম আজও আজও যাত্রাদলে প্রসিদ্ধ-উমেশ, ভোলানাথ ও কাশীনাথ ওরফে কেশে ধোবা। উমেশ ও ভোলানাথ বিদ্যা ও সুন্দরের ভূমিকায় অভিনয় করতেন, আর কাশীনাথ অভিনয় করতেন মালিনীর ভূমিকায়। মালিনীর ভূমিকায় স্বয়ং গোপাল প্রথমে অভিনয় করতেন। ভৈরব হালদার ছিলেন গোপালের গানের সুরকার। তিনি হুগলীর সিঙ্গুরের অধিবাসী। গোপাল যখন নিজে দল করলেন, তখন সম্ভবত নিজে আর অভিনয় করতেন না। তখন কেশে ধোবা মালিনী সাজত; কেশে ধোবা আগে থেকেই খেমটা নাচ শিখেছিল; বিশ্বকোষ-এর মতে তার মতো খেমটা নাচ তখন আর কেউ নাচতে পারত না। বিদ্যাসুন্দর যাত্রা গোপালের হাতে পড়েই নতুন আকার ধারণ করে-

“বিদ্যা আরও ঘুরিয়া ঘুরিয়া নাচিতে থাকে। রসিক শ্রোতাদিগের আত্মাদের আর সীমা থাকে না। বিদ্যার কঙ্কাল যেমন দুর্লভেছে, বৈশ্য স্বভাবানুকরণে সুপটু নট, কেমন নয়ন, হৃদয় ইত্যাদি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নাচাইতেছে। ইহা দেখিয়া দুর্ভাগ্য সুন্দরের বিপদ শ্রোতার একেবারে ভুলিয়া যায়।”

যেমন অভিনয়, দর্শকও তেমন-

“বাবুর চমকা ভেঙ্গে গেল; দেখলেন, কোটাল মালিনীকে মাচ্ছে; মালানী বাবুর দোহাই দিচ্ছে; অথচ পার পাচ্ছে না। এতে বাবু বড় রাগত হলেন, ‘কোন বেটার সাধ্য মালিনীকে আমার কাছ থেকে নিয়ে যায়’-এই বলে সামনের রূপোর গেলাসটি কোটালের রগ তেগে ছুঁড়ে মাল্লেন।”

শেষে ভোর ভোর সময়ে দক্ষিণ স্থানে কোটালের হ্যাঙ্গমাতে বাবুর নিদ্রাভঙ্গ হল; কিন্তু আসরে কেউকে না দেখে বাবু বিরক্ত হয়ে ‘কেউ ল্যাও, কেউ ল্যাও’ বলে ক্ষেপে উঠলেন। অন্য অন্য লোকে অনেক বুঝলেন যে, বিদ্যাসুন্দর যাত্রায় কেউ নাই। কিন্তু বাবু কিছুতেই বুঝলেন না। কেউ তাঁকে নিতান্ত নির্দয় হয়ে দেখা দিলেন না মনে করে, ভেউ ভেউ করে কাঁদতে লাগলেন।

বঙ্গদর্শনের প্রবন্ধ প্রকাশনার দশ বৎসরের মধ্যে ‘ভারতী’ পত্রিকাতে লেখা হয়েছিল-

“আমাদের এ পোড়া দেশে কাজকর্ম নাই, অদৃষ্টের সহিত সংগ্রাম নাই, আলস্য তাহারস্থল শরীর লইয়া স্থূলতর উপাধানে হেলিয়া হাই তুলিতেছে, ইন্দ্রিয়পরতা ও বিলাস, ফুলমোজা, কালাপেড়ে ধুতি, ফিনফিনে জামা পরিয়া বুক চাঁদর বাঁধিয়া পান খাইয়া চোঁট ও ব্রাত্রি জাগরণে চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া গুড়গুড়ি টানিতেছে- এই ত চারিদিকের অবস্থা। এমন দেশের কবিতায় চরিত্র-বৈচিত্র্যই বা কোথায় থাকিবে, মহান চরিত্রচিত্রই বা কোথায় থাকিবে, আর বিবিধ মনোবৃত্তির খেলাই বা কিরূপে বর্ণিত হইবে?”

ইংরেজের স্নেহচ্ছায়ায় লালিত বঙ্গীয় সামন্ততন্ত্রের এমনই অর্থব্দ অবস্থা সেদিন!

গোপাল উড়িয়ার বিদ্যাসুন্দর যাত্রা ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের বাঙালীর বিকৃত রস-পিপাসার চূড়ান্ত দলিল। এই যাত্রা পালার একাধিক সংস্করণ পাওয়া গেছে। শোনা যায় গোপালউড়ের যাত্রায় তিনটি ‘সাঁট’ ছিল। সেকালের সকল জনপ্রিয় কবিরায় ও পাঁচালীকারই আসর বুঝে গান সাজাতেন। আসরের দর্শক বা শ্রোতার চরিত্র বুঝে এই ‘সাঁট’ নির্ণীত হত। নানা জনের গান নিয়ে এই পালা রচিত- আর সে যুগের সকল গানেই এক ধূয়া, আদরসের বিশেষ দিকটির সরব ঘোষণা। হরিমোহন মুখোপাধ্যায় লিখেছেন-

“গোপাল রাধামোহনের বিদ্যাসুন্দরের একেবারে পরিবর্তন করিয়া ফেলিল। সহজ বাঙ্গালা ভাষায় গান সংগ্রহ করিয়া গোপাল নূতন পালার সৃষ্টি করিল। শুনিতে পাই গোপাল উড়ের গান, গোপালের দ্বারা একটিও রচিত নহে। কৈলাস বারুই, শ্যামলাল মুখোপাধ্যায় এবং হুগলি জেলার সিঙ্গুর-গোপালনগর নিবাসী ভৈরব হালদার প্রভৃতির অনেক ভাল গান বিদ্যাসুন্দরের টপ্পা সন্নিবেশিত হইয়াছে। যিনিই যে গান বাঁধুন না কেন, অস্তিত্ব আর কাহারও নাই, আছে কেবল গোপাল উড়ের।”<sup>১১</sup>

গোপাল উড়ের পালায় নিশ্চিত ভাবে কারা গান যুগিয়েছিলেন, সে খবর পাওয়া যায় না। বটতলার কল্যাণে আজ গোপাল উড়ের নামে অনেকগুলি পালা প্রচলিত আছে; তার মধ্যে কোনটি গোপাল উড়ের পালা, তা বলা দুষ্কর। তবে অনুমান হয় শ্যামলাল মুখোপাধ্যায় সংগৃহীত পালাটিই গোপালের পালা। হরিমোহন মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত পালার সূচনায় আছে ভিস্তির দুইটি গান, একটি কালুয়ার গান, পাঁচটি মেথরানীর গান। তারপর জুড়ীর গান। জুড়ীর গান হল পালার নান্দীমুখ। সূত্রধার পূর্বে যে কাজ সম্পন্ন করতেন, জুড়ী এখানে তাই করছে। যাত্রায় এই জুড়ীপ্রথা বদন অধিকারী প্রবর্তন করেছিলেন। জুড়ী কি বলল?

“হায়। রসিক সুজন,           নারীর মনোরঞ্জন,  
প্রিয়া সনে সঙ্গোপনে করেন সুখ-আলাপন।  
ছলে বলে কৌশলে,           মালিনীরে ফাঁকি দিলে,  
উভয়েরপ্রেম অন্তঃশীলে, বহে ফল্লু নদী যেমন।  
কি সুন্দর শুনিতে বিদ্যাসুন্দর-উপাখ্যান।  
মাটির ভিতর আনাগোনা   আর কার সাধ্য, বল না,  
বিনা দৈবেরই ঘটনা, না হয় ঘটন।  
যেমন রতিপতি,           তার চেয়ে বিদ্যাপতি,  
মাটির ভিতর একি রীতি উভয়ে গমনাগমন।  
বৎসর পনের ষোল হইল বয়ঃক্রম।  
ভেবে মরে রাজারানী হইবে কেমন।”<sup>১২</sup>

তারপর রাজার উক্তিকন্যাদায়গ্রস্ত পিতার খেদোক্তির মতোই। বরের খোঁজে গঙ্গাভাট কাঞ্চীপুরে গিয়েছে, রাজার উক্তিতে এসংবাদ জানা গেল। তখন সুন্দর আসরে প্রবেশ করল। তার প্রথম কথাই চাঁছাছোলা-

“এতদিনের পরে বুঝি বিধি অনুকুল।  
ফুটাইয়ে দিল মম বিবাহের ফুল।”<sup>১৩</sup>

তারপরে গড়গড়িয়ে চলল পালা। উপসংহারে ভরতবাক্যও আছে। হরিমোহন মুখোপাধ্যায়ের সংস্করণ ছাড়া আরও কয়েকটি সংস্করণ আছে-

(ক) ছাঁকা বিদ্যাসুন্দর টপ্পা (১ম খণ্ড), ১২৮২বঙ্গাব্দ, অঘোরচন্দ্র ঘোষ বিরচিত ও সঙ্কলিত, গোপাল উড়িয়ার সুর ও নানাবিধ চুটকি সুর সংবলিত এবং চৈতন্য চন্দ্রোদয় যন্ত্রে (৩১৯নং চিৎপুর রোড, বটতলা) মাখনলাল ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত যদুনাথ দত্ত দ্বারা প্রকাশিত। পৃষ্ঠা সংখ্যা- ৪৪, গীত সংখ্যা- ১১৭।

(খ) নূতন ছাঁকা বিদ্যাসুন্দর টপ্পা (৪র্থখণ্ড), ১২৮২ বঙ্গাব্দ, ১ম সংখ্যা,। নন্দলাল রায় প্রণীত ও সঙ্কলিত গোপাল উড়িয়ার সুর সঙ্কলিত ও ত্রৈলোক্যনাথ দত্ত দ্বারা প্রকাশিত। ১১৭নং চিৎপুর রোড, বটতলা। পৃষ্ঠা সংখ্যা- ৩৬, গীত সংখ্যা- ১১৪।

(গ) বিদ্যাসুন্দর গীতাভিনয় টপ্পা (১-৫ খণ্ড), ১২৮২বঙ্গাব্দ, শ্যামলাল মুখোপাধ্যায় প্রণীত ও (ভৈরবচন্দ্র গোপাল উড়িয়া কৈলাস বারুই প্রভৃতির গীত) সঙ্কলিত এবং বিদ্যারত্নযন্ত্রে (২৮৫নং আপার চীৎপুর রোড, শোভাবাজার) অরুণোদয় ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত ও পাণ্ডবচরণ ঘোষ দ্বারা প্রকাশিত। পৃষ্ঠা সংখ্যা- ১১৬, গীত- ৩৪০।

(ঘ) বিদ্যাসুন্দর গীতাভিনয় নূতন সংস্করণ, ১৩১৮বঙ্গাব্দ, গোপাল উড়িয়া কর্তৃক বিরচিত এবং মজুমদার লাইব্রেরী (মজুমদার প্রেস, ১০৬ নং আপার চীৎপুর রোড, বটতলা) হইতে নুটবিহারী মজুমদার দ্বারা সংগৃহীত মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

-এগুলি বটতলার সংস্করণ, তত ভদ্রভাবে প্রকাশিত হয়নি। বঙ্গবাসী সংস্করণ অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন। মজুমদার লাইব্রেরী থেকে প্রকাশিত গীতাভিনয়খানি ব্যতীত আর সবগুলি গ্রন্থনা একই জাতীয় গানের পর গান সাজানো। প্রথমে আছে ভিত্তি মেথরা কালুয়া ভেলুয়ার সঙ, পরে পালা। মজুমদার লাইব্রেরী প্রকাশিত গ্রন্থে কেবল গদ্য-সংলাপ আছে। কিন্তু আসলে গোপাল উড়ের বিদ্যাসুন্দর পালায় কোন গদ্য সংলাপ ছিল না। ‘ভদ্রার্জুন’ নাটকের ভূমিকায় তারাচরণ শীকদার এ সংবাদ দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানিয়েছেন। তারাচরণ শীকদারের নাটক ১৭৭৪ শকাব্দে অর্থাৎ ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়, অর্থাৎ গোপাল উড়িয়ার জীবিতকালে এবং বিদ্যাসুন্দর যাত্রার প্রবল প্রতিপত্তির যুগে। তিনি লিখেছেন-

“আক্ষেপের বিষয় এই যে, এদেশের নাটকের ক্রিয়া সকল রচনার শৃঙ্খলানুসারে সম্পন্ন হয় না। কারণ কুশীলববর্গ রঙ্গভূমিতে আসিয়া নাটকের সমুদায় বিষয় কেবল সঙ্গীত দ্বারা ব্যক্ত করে এবং মধ্যে মধ্যে অপ্রয়োজনীয় ভণ্ডগণ আসিয়া ভণ্ডামি করিয়া থাকে।”<sup>১৪</sup>

তারাচরণ শীকদারের সাক্ষ্যের পর এবিষয়ে আর দ্বিতীয় কোন মত থাকতে পারে না। শ্যামলাল মুখোপাধ্যায়ের সংস্করণ সর্বাপেক্ষা প্রামাণিক; তিনি গোপালের দলভুক্ত ছিলেন। তদুপরি তাঁর গ্রন্থ গোপালের মৃত্যুর পঁচিশ বৎসরের মধ্যে প্রকাশিত হয়। কাজেই সময়ের এমন বেশি ব্যবধান নেই, যার জন্য স্মৃতি প্রভারণা করতে পারে। তাঁর কাছে গোপালের পালার অনুলিপি থাকা খুবই স্বাভাবিক। শ্যামলাল তাঁর সংগৃহীত পালায় ভৈরবচন্দ্র ও কৈলাস বারুই-এর পাশে গোপালেরও স্থান দিয়েছেন। তবে অনেকের মতে গোপাল উড়িয়ার বিদ্যাসুন্দর পালায় গোপালের এক পংক্তি রচনাও নেই। কারণ এই প্রকার স্মার্ট স্বচ্ছন্দ মুখের বুলি দু-একদিনের অনুশীলনে অধিগ্রহণ হওয়া সম্ভব নয়।

(ক) যাদু এমন কথা কেন বললি। ভোরের বেলায় সুখের স্বপন, এমন সময় জাগালি।

(খ) ছেঁড়া চুলে, বকুল ফুলে, খোঁপা বেঁধেছে। প্রেম কি ঝালিয়ে তুলেছ।

(গ) মদন আগুন, জ্বলছে দ্বিগুণ, করলে কিগুণ, ঐ বিদেশী।

(ঘ) তুমি যে পরের সোনা, আগেতে ছিল না জানা, জানতেন যদি পরের সোনা, পরিতেন না কর্ণমূলে।<sup>১৫</sup>

-এই চলিত বাংলা কাজ-চালাবার ভাষা নয়, ভারতচন্দ্রীয়বা বীরবলী ভাষার কাছাকাছি। এই অনায়াস ভাষা প্রভূত আয়ত্বসাপেক্ষ। যাজপুরে গোপাল উড়িয়ার পক্ষে এ ভাষা আয়ত্ত করা সহজ নয়। সেকালের কবিসঙ্গীত রচয়িতাদের মধ্যে সকলের পক্ষেও এই দক্ষতা অর্জন সম্ভব ছিল না। রাম বসু বা সমর্থমা কোন কবির পক্ষেই কেবল এটা সম্ভব ছিল। যদিও রাম বসুর প্রসঙ্গ তেমন কোথাও লেখা হয়নি। রাম বসুর গান অদ্যাবধি সংকলিত হয়নি। এমন কি, যে সব গান সংগৃহীত হয়েছে, তারও পূর্ণ বয়ান পাওয়া যায়নি। ঈশ্বরগুপ্ত লিখেছেন-

“আমরা পশ্চাৎগে উক্ত বসুর প্রণীত যে সকল গান প্রকাশ করিলাম যদিও তাহার কোন কোন গানের কোন কোন অংশের অভাব আছে, তথাচ তৎপাঠেই পাঠকগণ অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইবেন তাহাতে সন্দেহ নাই।”<sup>১৬</sup>

এ খবর স্বীকৃত হয়েছে যে, রাম বসু মোহন সরকারের দলের পক্ষে গান লিখতেন; আরও অনেকের জন্য গান লিখেছেন। এই সব গান গোপালের বিদ্যাসুন্দরের পালার মধ্যে ঢুকে যাওয়া অসম্ভব নয়। কারণ ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দেই ঈশ্বরগুপ্ত রাম বসুর সব গানের তল্লাস পাননি। বিদ্যাসুন্দর টপ্পাতে এইগুলি আশ্রয় লাভ করলে খুঁজে পাওয়া সহজ ছিল না। রাম বসুর নিম্নোক্ত গানগুলি কি গোপাল উড়িয়ার টপ্পার প্রতিধ্বনি নয়?

(ক) “তোরে ভালোবেসেছিলাম বোলে কিরে প্রেম আমার দুকুল মজালি।

দু মাস না যেতে, দারুণ বিচ্ছেদের হাতে, সঁপে দিয়ে আমায় ফেলে পালালি।”<sup>১৭</sup>

(খ) “এমন ভাব রাখা ভাব কোথায় শিখিলে। সে ভাব কোথাহে, যে ভাবে ভুলালো।”<sup>১৮</sup>

(গ) “রমণী হোয়ে রমণীরে রতি মজালে। তারো মৃতপতি, কেন বাঁচালো। বিরহিনীর দুখ ঘটালে।”<sup>১৯</sup>

(ঘ) “প্রাণ তুমি এ পথে আর এসো না। শুধু দেখা, দিবে সখা, সেতো তা, মনেতে বুঝবে না।”<sup>২০</sup>

(ঙ) “না বুঝে মজেছি প্রেমে, কপাল ক্রমে, একে হোলো আর।

আমি প্রাণ জুড়াতে গেলেম, শেষে প্রাণ বাঁচানো ভার।”<sup>২১</sup>

গোপাল উড়িয়ার টপ্পার অনেকগুলি গানই একই রকম দাপটের সঙ্গে লেখা। তার ভাষা উনিশ শতকের স্ফুর্তিবাজ মজলিশী অতি-রসিক সমাজের বে-আব্রু ভাষা। একথা সত্য, সে-যুগে ব্যক্তিভেদে এই ভাষার বিশিষ্টতা খুব বেশি ফুটতনা; তবু একমাত্র রাম বসুর লেখাতেই এমন একটা চতুর মসৃণতা দেখা যেত, যা অন্যত্র দুর্লভ। এই পালার অনেকগুলি গান রাম বসুর লিখিত হওয়া বিচিত্র নয়; কারণ রাম বসু ভবানীপুরের দলের জন্য ‘নলদময়ন্তী’র গান লিখে দিয়েছিলেন। রাম বসুর মৃত্যুর পর গোপাল দল করেছিলেন। গোপালের পালা রাধামোহন সরকারের বা অন্য কারও গ্রন্থনা। এই প্রাপ্ত পালাটি প্রয়োজনমতো গোপাল অদল-বদল করে নিতেন। আর রাধামোহনের কালে রাম বসু ছিলেন জীবিত এবং অতিশয় জনপ্রিয়।

**Conclusion:** গোপাল তাঁর পালার গানগুলিতে নিজে সুর সংযোগ করেছিলেন; নৃত্য-পরিকল্পনাও তাঁরা প্রথম জীবনে নিজেই নাচতেন, পরে তাঁর সাকরেদ কেশে ধোপা প্রভৃতি নাচতেন। নৃত্য-সংযোজনায় তিনি নতুন রীতির প্রবর্তন করেছিলেন। এটা সম্ভবত ওড়িয়া-সংস্কৃতির বঙ্গীয়করণ। বাংলাদেশের প্রচলিত যাত্রার নাচগানের সঙ্গে পয়ারও ছিল। গোপাল পয়ার সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করেন। ওড়িয়ায় নাটক অর্থে নাচ, বাংলা দেশে এই বিধান থেকে বেরিয়ে আসবার চেষ্টা চলছিল। গোপাল গান ও নাচকে একত্রে বেঁধে একটি পুরো ‘Ballet’ তৈরি করলেন। একখানি ইংরিজি পত্রিকায় ঐ ধরনের নাট্য-প্রয়াসের জন্য সুপারিশ করা হয়েছিল। বিদ্যাসুন্দর পালা বৈষ্ণব ভাব-পরিমণ্ডলের প্রভাব থেকে মুক্ত ছিল না। নায়ক ধীর ললিতগুণ সম্পন্ন হলেই চলবে, মধুর রসই মুখ্যরস, এই সব সিদ্ধান্ত মেনে চলা হয়েছে। কেবল নায়িকা পরকীয়া নন, তিনি অনূঢ়া। তবু এই পালা আদিরস-ভিত্তিক এবং আধ্যাত্মিকতা-বর্জিত। স্পষ্টতই দেখা যাচ্ছে যে, প্রচলিত ঝুমুর-সঙ্গীত ও কৃষ্ণযাত্রার গঠনরীতির সঙ্গে গোপালের নিজস্ব-ঠাট যুক্ত হয়ে এই বিচিত্র ‘যাত্রা’র সৃষ্টি। আঙ্গিক পুরাতন, শুধু স্পর্ধাটা নতুন। কলকাতার বিলাসী ধনীর দল এত দিন কৃষ্ণ ও রাধাকে সামনে রেখে, প্রমোদলোলুপতা চরিতার্থ করত; এবার লাস্যের সেই বাতাবরণ খারিজ হল।

## Reference

১. আচার্য্য, দেবেশ কুমার। (২০২০)। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, আদি ও মধ্যযুগ, ইউনাইটেড বুক এজেন্সি, পৃষ্ঠা- ৫৬৪
২. পূর্বোক্ত
৩. যাত্রা সমালোচনা, বঙ্গদর্শন পত্রিকা, ১২৭৯, বৈশাখ সংখ্যা
৪. পূর্বোক্ত
৫. বসু, নগেন্দ্রনাথ। (১৩১১)। বিশ্বকোষ, পঞ্চদশ ভাগ, বসু এন্ড কোং, পৃষ্ঠা- ৭১০
৬. পূর্বোক্ত, যাত্রা সমালোচনা

৭. লাহিড়ী, দুর্গাদাস। (১৩১২)। বাঙ্গালীর গান, বঙ্গবাসী ইলেক্ট্রো-মেশিন প্রেস, পৃষ্ঠা- ৩৬০
৮. পূর্বোক্ত, যাত্রা সমালোচনা
৯. সিংহ, কালীপ্রসন্ন। হুতোমপ্যাঁচার নক্সা, বসুমতী সাহিত্য মন্দির, পৃষ্ঠা- ৩৬
১০. বাঙ্গালী কবি নয় কেন, ‘ভারতী’ সাহিত্য পত্রিকা, ১২৮-৭, আশ্বিন সংখ্যা
১১. মুখোপাধ্যায়, হরিমোহন। (১৩৬৭)। গোপাল উড়ে টপ্পা, বঙ্গবাসী ইলেক্ট্রো-মেশিন প্রেস, পৃষ্ঠা- ২
১২. পূর্বোক্ত
১৩. পূর্বোক্ত
১৪. শীকদার, তারাচরণ। (১৭৭৪)। ভদ্রার্জুন, চৈতন্যচন্দ্রোদয় যন্ত্রে মুদ্রিত, পৃষ্ঠা- ৪
১৫. মৈত্র, সুরেশচন্দ্র। (২০১০)। বাংলা নাটকের বিবর্তন, রত্নাবলী, পৃষ্ঠা- ১১১
১৬. দত্ত, ভবতোষ। (১৩৬৫)। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত রচিত কবিজীবনী, ক্যালকাটা বুক হাউস, পৃষ্ঠা- ২১২
১৭. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ২২০
১৮. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ২২৮
১৯. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ২২৯
২০. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৩১৫
২১. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৩০৪

**Citation:** Sau Bhaumik. M. & Banerjee Roy. S., (2026) “বিদ্যাসুন্দর যাত্রা’র উদ্ভব, গোপাল উড়ে ও রাম বসুর কৃতিত্ব : একটি সমীক্ষা”, *Bharati International Journal of Multidisciplinary Research & Development (BIJMRD)*, Vol-4, Issue-08, August-2026.